কল্পতরু সারদা

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা, বাংলাদেশ

ইংরেজী ১৯৯৭ খ্রীস্টাব্দটি ছিল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বছর। এই বছরেই পাশ্চাত্যভূমিতে ভারতের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করে স্বামীজীর স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের শতবর্ষপূর্তি এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘদেহের এক অংশ 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠার শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠিত হয়। এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এই বছরটি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমহলে আরো একটি অপূর্ব যোগাযোগের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেই যোগাযোগ হলো এক অসাধারণ আকস্মিক অথচ পরম আনন্দদায়ক সমাপতন বা 'কো-ইনসিডেন্স' (co-incidence)। সেবার বছরের প্রথম দিনটিতেই (১লা জানুয়ারি) পড়েছিল শ্রীশ্রীমায়ের শুভ আবির্ভাবতিথি। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমহলে ১লা জানুয়ারি 'কল্পতরু দিবস' নামে সুপ্রসিদ্ধ। গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র, মনোমোহন, অক্ষয়কুমার প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী পার্ষদ্বৃন্দ সহর্ষে এবং সপ্রত্যয়ে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারিকে 'কল্পতরু দিবস' বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা একান্তভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, ঐদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সর্ববিধ মনস্কাম পূর্ণ করার জন্য পরম করুণায় অযাচিতভাবে 'কল্পতরু' হয়েছিলেন। তাঁদের ঘোষণা এবং বিশ্বাসের পশ্চাতে ছিল তাঁদের নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তি। তাঁরা সেদিন যে যা প্রার্থনা করেছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাই পূর্ণ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তম সেজন্য বিশ্বাস করেন, প্রতি বছর ১লা জানুয়ারি নরদেবতার করুণার 'হরির লুঠ' বিতরণের দিন। ঐদিন তাঁর কাছে যে যা চাইবে তাই পাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী পার্ষদ্বৃন্দ অবশ্য শুধু ঐ দিনটিকেই তাঁর 'কল্পতরু দিবস' বলে মনে করেননি, ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি যে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে অপ্রার্থিত করুণা-বিতরণ-আর্তি এক বিশেষ প্রকাশ ঘটেছিল, সেকথা তাঁরা স্বীকার করেছেন কিন্তু তাঁরা মনে করতেন, শুধু ঐ একটি দিনেই তিনি 'কল্পতরু' হয়েছিলেন বললে করুণার বরুণালয়ের প্রতি অবিচার করা হয়। কারণ, তিনি যে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তেই 'কল্পতরু'। তিনি যে 'নিত্যকল্পতরু'। কিন্তু তিনি

পুরাণপ্রসিদ্ধ 'কল্পতরু' নন। উচ্চারিত অথবা অনুচ্চারিত, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, শুভ অথবা অশুভ যাই মনে উঠবে পুরাণের কল্পবৃক্ষ তাই পূর্ণ করে দেয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এমনি কল্পবৃক্ষ যাঁর করুণা কোন শর্তাধীন নয়। সেখানে উচ্চারণ অথবা অনুচ্চারণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছার কোন ভূমিকা নেই। গৃহী–সন্ন্যাসী, নারী–পুরুষ, সৎ–অসতের কোন বিচার নেই। স্থান, কাল, পাত্রের কোন বিবেচনা নেই। করুণার নির্বিচার নির্বাধ জাহ্নবীধারা সেই উৎসমুখ থেকে নিরন্তর প্রবাহিত। সেখানে অশুভের, অকল্যাণের কোন অস্তিত্ব নেই। সেখানে শুধুই শুভ, শুধুই কল্যাণ। শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের নিত্য কল্যাণ–কল্পতরু। সেখানে শুধু অভয় ও মাভৈঃ–এর অমেয় আশ্বাস ও অঙ্গীকার।

সেবছর (ডিসেম্বর ১৯৯৭) 'কল্পতরু' উৎসবের দিন শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথি পড়ায় ভক্তদের বলতে শোনা গিয়েছিলঃ ''ঠাকুর বছরে বছরে 'কল্পতরু' হন, এবার আমাদের মা–ও হয়েছেন কল্পতরু।'' সেবছর আরো আনন্দের কারণ এজন্য ছিল যে, সেবার একবছরের মধ্যে মায়ের দুবার জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১লা জানুয়ারি এবং ২১ ডিসেম্বর। সত্যিই ধন্য সেই বছরটি ধন্য ১৯৯৭ খ্রীস্টাব্দ অদূর অতীতে এরকম সমাপতন হয়েছিল ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে। সেবছর ১লা জানুয়ারি এবং ২২ ডিসেম্বর পড়েছিল মায়ের পুণ্য আবির্ভাবতিথি।

কিন্তু মা–ও কি শুধু ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে এবং তার উনিশ বছর পর ১৯৯৭ খ্রীস্টাব্দে 'কল্পতরু' হয়েছিলেন? না, ঠাকুরের মতো মা–ও তো 'নিত্যকল্পতরু'। ঠাকুরের মতো মায়ের করুণাপ্রবাহও দেশ, কাল, পাত্র মানে না। সকলের প্রতি, সর্বকালে, সর্বদেশে তাঁর করুণার বিগলিত জাহ্নবীধারা প্রবাহিত। তবে স্বামী বিবেকানন্দ সহ ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ এবং নাগমশায়, গিরিশচন্দ্র সহ ঠাকুরের গৃহী সন্তানগণ বলতেন, করুণা বিতরণের ক্ষেত্রে মা ঠাকুরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। স্বামীজী বলতেন : ''মায়ের কৃপা আমার ওপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষগুণ বড়।'' নাগমশায় ও গিরিশচন্দ্র বলতেন : ''বাপের চেয়ে মা দয়াল।''

বস্তুত, এখানে 'কম–বেশি' বা 'ছোট–বড়'–র কোন ব্যাপার নেই। কারণ, ঠাকুরই তো মাকে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর চেয়ে ''ঢের বেশি'' করার জন্য। যা তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণত করতে পারেননি–সেই মাতৃভাবকে জগতে প্রকাশ করার জন্য তিনি মাকে রেখে গিয়েছিলেন বলে স্বয়ং মা বলেছেন।

তাছাড়া, ঠাকুর এবং মা তো আলাদা নন। তাঁরা অভেদ এবং অভিন্ন। মায়ের করুণা এবং ঠাকুরের করুণায় কোন পার্থক্য নেই। যা মায়ের করুণা, তাই আবার ঠাকুরেরও করুণা। তবে এবার জগৎকে ঠাকুর 'মা' মন্ত্র শিখিয়েছিলেন কিনা, তাই ঠাকুর অপেক্ষা মায়ের মধ্যে আমরা করুণার অধিক প্রকাশ দেখতে পাই। কারণ, ঠাকুর যে এবার 'মা' মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে একটি চেতন মন্ত্রতনুও দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন রক্ত-মাংসের এক অনির্বচনীয় মাতৃমূর্তি। সেই জীবন্ত মন্ত্রমূর্তি এবার নিত্যকল্পতরুরূপে অভয় ও মাভৈঃ-এর অমেয় আশ্বাস ও অঙ্গীকারের বার্তা নিয়ে আমাদের পৃথিবীতে দীর্ঘ সাতষট্টি বছর কাটিয়েছিলেন। তার মধ্যে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের পর এবং আঠারো বছর স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর। মরলীলা তাঁর সাঙ্গ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তিনি এখনও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। তিনি এখন সূক্ষ্মভাবে নিত্য কল্যাণ-কল্পতরু হয়ে আমাদের রক্ষা করছেন। সুতরাং মা শুধু উল্লিখিত দুটি বছরই 'কল্পতরু' হননি, তিনিও ঠাকুরের মতো নিত্যকল্পতরু। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে যখন এরকম সমাপতন ঘটেছিল তখন আমাদের পরম পূজ্যপাদ দ্বাদশ প্রেসিডেন্ট মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী (তখন তিনি অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট) বলেছিলেন : "গত রবিবার (১লা জানুয়ারি ১৯৭৮) শ্রীশ্রীঠাকুরের কল্পতরু-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-উৎসবও উদ্যাপিত হয়েছে। ভক্তরা আনন্দ করে বলছেন, 'এবার মা-ও কল্পতরু হয়েছেন। ঠাকুর কল্পতরু হন বছরে বছরে, এবার মা-ও হয়েছেন।' " তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'আসল কথা'টিও জানিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন : "আসল কথা এই যে, মা শুধু এবার নয়, বছরে বছরে নয়, দিনে দিনে কল্পতরু হয়েছিলেন, আছেন ও থাকবেন।

"ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁর পার্ষদরা বলেছেন যে, তিনি তাঁর ভক্তদের বেছে বেছে নিতেন, কিন্তু মায়ের কাছে সকলেরই অবারিত দ্বার। আর বাস্তবিক সেটাই তো স্বাভাবিক। মায়ের কাছেও যদি ছেলেমেয়ের জন্য মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ হয়, তাহলে সেই মা-ই বা কেমন, আর সেই ছেলেমেয়েরাই বা যায় কোথায় সুতরাং মায়ের কাছে ছেলেমেয়ের জন্য দ্বার সবসময়েই অবারিত। আর সেই দৃষ্টিতে দেখলে সত্যি সত্যি মা-ই কল্পতরু-শুধু বছরে একদিন নয়, বছরে ৩৬৫ দিন। এবং মায়ের আবির্ভাবের কাল থেকে আরম্ভ করে যতদিন তাঁর ভক্তরা থাকবেন, ততদিন তাঁর এরকম কল্পতরু হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।" (দ্রঃ 'উদ্বোধন', পৌষ ১৩৮৫, পৃঃ ৬৪২)

সত্যিই 'কল্পতরু' হওয়া ছাড়া মায়ের 'গত্যন্তর' নেই মা স্বয়ং বলতেন, আমার সকল সন্তানকে নিত্যধামে আমি নিজে নিয়ে যাব। তাদের একজনেরও বাকি থাকতে আমার ছুটি নেই। এই 'দায়' যিনি স্বয়ং স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন তাঁর গত্যন্তর থাকবে কী করে? মা বলতেন, আমি দয়ায় আত্মহারা হয়ে যাই। কে হিন্দু কে মুসলমান কে খ্রীস্টান, কে দেশী কে বিদেশী, কে সৎ কে অসৎ, কে সাধু কে গৃহী, কে ব্রাহ্মণ কে অন্ত্যজ–তা আমি জানি না। সবাই আমার সন্তান। ধুলো–কাদা তো মানুষ মাখবেই। কিন্তু আমি যে মা মা কি ধুলো–কাদা–মাখা সন্তানকে ফেলে দেন, না তাকে ধুয়ে মুছে তাঁর কোলে তুলে নেন? আমি তাই করি এবং করব। কারণ, আমি যে মা সকলের মা। আমি মা থাকতে কার কী ভয়, কাকে ভয়, কিসের ভয়? বিধাতারও সাধ্য নেই আমার সন্তানদের কোন ক্ষতি করার।''

এমন কল্পতরু মা থাকতে আমাদের ভয় কী? মৃত্যুকে মানুষ ভয় পায়, বিপর্যয়কে, দুঃখকে, ঘাত–প্রতিঘাতকে মানুষ ভয় পায়। কিন্তু মায়ের অভয়মন্ত্র স্মরণ রাখলে আমরা কি মৃত্যুর মুখোমুখি হতে আর ভয় পাব?–না বিপর্যয়, দুঃখ, ঘাত–প্রতিঘাতে বিচলিত হব?

মনে পড়ছে সেই অসাধারণ উদ্ঘোষণের কথা, যেখানে মা শ্রীরামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট নির্দেশকেও অস্বীকার করছেন। 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা' আমাদের মা–ঠাকরুকে সেদিন ঠাকুর বলেছিলেন, তিনি যেন যার–তার হাতে তাঁর (ঠাকুরের) খাবার না পাঠান, যেন সর্বদা নিজেই তাঁর খাবার নিয়ে আসেন। মা জানতেন, অপাপবিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ কারো মধ্যে অপবিত্রতার লেশমাত্র থাকলে তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারতেন না। সেরকম কারো স্পর্শযুক্ত খাবার বা পানীয় গ্রহণ তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। অজানিতে করলেও তাঁর শরীর–মন বিদ্রোহ করত। তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হতেন, তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ত। মা জানতেন, ঐরকম হলে ঠাকুরের খাওয়াই হবে না। তবু তিনি সেদিন সকাতরে কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় ঠাকুরকে বলেছিলেন : ''তা তো আমি পারব না ঠাকুর... আমায় 'মা' বলে চাইলে আমি তো না দিয়ে থাকতে পারব না'' শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন অবশ্য মায়ের কথায় খুশিই হয়েছিলেন, কারণ সেই অন্নই তিনি হাসতে হাসতে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের মনে হয়, তিনি সেদিন কল্পতরু নিত্যজননীর অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশকেই আবাহন করতে চাইছিলেন এবং দেখে নিশ্চিন্ত

হয়েছিলেন যে, মায়ের মধ্যে ঐ সত্তার অভ্রান্ত উদ্বোধন ঘটেছে। নতুবা তিনি প্রসন্ন হাস্যে ঐ দুশ্চরিত্রা নারীর স্পৃষ্ট অন্নই অবলীলায় গ্রহণ করলেন কিভাবে?

বস্তুত, সন্তানদের জন্য মা সব করতে পারতেন। তিনি বলতেন, ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে তিনি সমাজ, শাস্ত্র, লোকাচার কোন কিছুরই পরোয়া করেন না। সন্তানদের প্রতি স্নেহ ও করুণায় বিধি ও নিষেধের গণ্ডিকে তিনি বারবার ভেঙেছেন। করুণাবর্ষণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সত্য সত্যই 'গণ্ডিভাঙা' জননী।

মায়ের সেই 'গণ্ডিভাঙা' কল্পতরু-রূপের পরিচয় আমরা অগণিত বার পেয়েছি। কিন্তু মায়ের অবর্তমানে মায়ের নিত্য কল্যাণ-কল্পতরুত্বে বিশ্বাস কেমন করে মায়ের পাগলী মেয়ে রাধুর হৃদয়কে পরতে পরতে পূর্ণ করে রেখেছিল তার সংবাদ আমরা অনেকেই অবগত নই। মা যখন দেহে বর্তমান ছিলেন তখন রাধু-দি মাকে কত অবজ্ঞা করেছেন, কত গঞ্জনা দিয়েছেন, কত কটুকথা বলেছেন, এমনকি মায়ের ভাগবতী তনুতে আঘাতও করেছেন। এমন নয় যে, রাধু-দি তখন নিতান্ত বালিকা। তিনি তখন বয়সে যথেষ্টই পরিণত। মায়ের সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ এবং বিশিষ্ট-বিশিষ্ট অসংখ্য ভক্ত নরনারীর সমুচ্চ শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রকাশ তিনি নিত্য স্বচক্ষে দেখেছেন। কিন্তু সে-সমস্ত তখন তাঁর মনে ও আচরণে কোনই রেখাপাত করেনি। তিনি তাঁর অদ্ভুত খেয়াল, আবদার ও নির্মম কথায় ও আচরণে মাকে অতিষ্ঠ করে চলেছিলেন। প্রায়ই সেই খেয়াল, আবদার ও আচরণ অত্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছাত। কিন্তু মা ছিলেন নির্বিকার এবং একইভাবে রাধুর প্রতি স্নেহশীলা। পরবর্তী কালে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং মৃত্যুপথযাত্রী সেই রাধু-দির কথায় ও আচরণে যে আশ্চর্য পরিবর্তন এবং মায়ের নিত্যকল্পতরুত্বে যে অপরিমেয় বিশ্বাসের জ্বলন্ত বিবরণ আমরা পেয়েছি তাতে আমরা স্তম্ভিত না হয়ে পারি না। প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী ঈশানানন্দ (শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম সেবক এবং 'মাতৃসান্নিধ্যে'র মতো অপূর্ব মাতৃস্মৃতি-গ্রন্থের লেখক) সে-সম্পর্কে যা লিখেছিলেন তা সম্পূর্ণত এখানে তুলে ধরছি :

"১৩৪৭ সালের ভাদ্রমাস। শ্রীশ্রীমায়ের পরম আদরের রাধু জয়রামবাটীতে মায়ের ব্যবহৃত ঘরখানিতেই বাস করিতেছে। কিছুদিন হইল ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া খুবই অসুস্থ হইয়া রাধু কলিকাতা নিবেদিতা স্কুলবাড়িতে আসিয়াছে। স্বামী আত্মবোধানন্দজী ডাক্তার দেখাইলে তাঁহারা 'টি-

বি' সন্দেহ করিলেন। কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজী (প্রিয় মহারাজ)-কে উহা জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেবাশ্রমের নিকটেই একটি বাড়ির দোতলাটি ভাড়া লইয়া রাধুকে পাঠাইবার জন্য তার করিলেন। আত্মবোধানন্দজী আমাকে অনুরোধ করিলেন নির্দিষ্ট দিনে নিবেদিতা স্কুলের একটি সেবিকা সহ রাধুকে কাশী লইয়া যাইতে। আমি রাধুকে লইয়া কাশী গেলাম। X-Ray-করিয়া দেখা গেল দুইটি ফুসফুসই বিশেষভাবে আক্রান্ত-দৈনিক ১০২ জ্বর, কাশি। জীবনের আশা নাই। সেবা-শুশ্রূষার সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমার জন্য ইন্টারক্লাসে বারোদিনের রিটার্ন টিকিট করা ছিল। কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার দিন বিকাল ৪টা নাগাদ রাধুর নিকট বিদায় লইতে গিয়া বলিলাম, 'রাধু, আমি আজ কলকাতা ফিরছি। তুমি নিশ্চিন্তভাবে থাক। সুস্থ হয়ে জয়রামবাটী যাবে। প্রিয় মহারাজ সর্বপ্রকার ব্যবস্থা ও দেখাশুনা করছেন। কোন চিন্তা করো না। পরে আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব।' রাধুর জ্বর বাড়িতেছে। ঘরে প্রিয়-দা, একটি সেবিকা ও আমি।

''রাধু আমার ঐসকল কথাবার্তা শুনিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কিন্তু একটু ঝাঁঝালো সুরে বলিতে লাগিল, 'আহা, হা বলি গোপাল-দা, [স্বামী ঈশানানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল 'বরদা'। মা তাঁকে 'বরদা' নামেই ডাকতেন। কিন্তু মায়ের সেজভাইয়ের নামও 'বরদা' হওয়ায় মামীমারা তাঁকে 'গোপাল' বলতেন। সেজন্য রাধু-দিরা তাঁকে 'গোপাল-দা' বলতেন] তোমার কী বুদ্ধি গো আমার কি অসুখ হয়েছে তা আমি জানি, তোমরা যতই গোপন কর না কেন। আমার যক্ষ্মা হয়েছে-এ-রোগে বুঝি আবার কেউ বাঁচে নাকি? তাই তুমি বলছ-ভাল হয়ে জয়রামবাটী যাবি।' আমি বলিলাম, 'রাধু ওসব কেন চিন্তা করছ? প্রিয়-দা সবরকম চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছেন। আর যদি কিছু অসুবিধা হয়, প্রিয়-দাকে বললে তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন, কিছু ভেবো না।' রাধু বলিয়া উঠিল, 'গোপাল-দা, সে-কথা বলছি না। তুমি সব জেনেশুনে বাজে কথা বলছ। তুমি কাশীতে রেখে যাচ্ছ, কারণ কাশীতে মরলে আমার মুক্তি হবে। এতদিন মায়ের কাছে থেকে এই বুদ্ধি হলো তোমার? যিনি জন্মাবধি আমার সব ভার নিয়ে সকল ব্যবস্থা করেছেন, তাঁর সেই ঘরখানিও আমার ব্যবহারের জন্য জীবনস্বত্ব করে গেছেন, আমি তাঁর চির আশ্রিত। তিনি কি আমার 'মুক্তি'র ব্যবস্থা করেননি? আমি যদি আঁস্তাকুড়েও পড়ে মরি, আমার মুক্তি তাঁর কৃপায় আমার হাতের মুঠোয় (হাত

মুঠো করে), সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না, দাদা।' প্রিয়-দার চক্ষে জল, আমি নীরবে মাথা নিচু করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। রাধু বলিতে লাগিল, 'আমার মৃত্যুর যে-স্থান মা ব্যবস্থা করে গেছেন, সেখানেই মরব। তোমাদের ভাবতে হবে না।' রাধুর সেই দৃঢ় বিশ্বাসের দৃপ্ত ঘোষণা আজও আমার কানে ধ্বনিত হইতেছে। সকলের অনুরোধে রাধু অল্প কিছুদিন কাশীতে থাকিয়া জয়রামবাটীতে ফিরিয়া গিয়া শ্রীশ্রীমায়ের নূতন বাড়িতে সেই ঘরখানিতেই সজ্ঞানে চল্লিশ বছর বয়সে শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর (১৩৪৭ সালে) সকাল ৯টায় শরীরত্যাগ করে। ধন্য মা ধন্য তোমার রাধু।" (৫ম সং, ১৯৮৯, পৃঃ ২১০-২১২)

এই মা কল্পতরু না হলে তবে কে কল্পতরু? দেহে যখন ছিলেন তখন তো কল্পতরু ছিলেনই, রাধু-দি তাঁর জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন মায়ের অবিনাশী অঙ্গীকারের মহিমা-দেহে না থাকলেও মা কল্পতরু-নিত্যকল্পতরু। V